❑ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ঃ

সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ওয়েলেসলি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের দ্বারাই একাধারে ইংল্যান্ডের সমৃদ্ধি ও শক্তি এবং ভারতবাসীর শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাই ভারতে পদার্পণ করেই তিনি নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সেই সাম্রাজ্যবাদকে রূপায়ণের অন্যতম অস্ত্র হিসেবে তিনি প্রয়োগ করেন অধীনতামূলক মিত্রতা *(Subsidiary Alliance)* নামক এক অদ্ভুত চুক্তি। ওয়েলেসলি ভারতীয় শক্তিগুলির রাজনৈতিক দৈন্য এবং ইংরেজের সামরিক সাহায্য লাভের ঐকান্তিক আগ্রহ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে, ভারতীয় শক্তিগুলিকে কোম্পানির সামরিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করতে পারলে খুব সহজে নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির অবতারণা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অধীনতামূলক মিত্রতার ধারণা ওয়েলেসলি উদ্ভাবন করেননি। লর্ড ক্লাইভ ও অযোধ্যার নবাবের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'এলাহাবাদের চুক্তি' (১৭৬৫ খ্রিঃ) এবং নিজামের সাথে কোম্পানির চুক্তি (১৭৬৮)-র মধ্যেও অধীনতামূলক মিত্রতার ধারণা বর্তমান ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস বা লর্ড কর্নওয়ালিসও এই ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরের আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তবে নানা কারণে এঁরা কেউই ব্যাপকভাবে এই ধরনের চুক্তি প্রবর্তন করেননি। স্বদেশের সমর্থন এবং এদেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করে লর্ড ওয়েলেসলি 'অধীনতামূলক মিত্রতা'র ব্যাপক প্রয়োগ করেন।

ওয়েলেসলি অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির শর্তাবলী এমনভাবে রচনা করেন, যাতে স্বাক্ষরকারী রাজা বা রাজ্যগুলি রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে কোম্পানির উপর অসহায়ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই চুক্তির শর্তে

বলা হয়— (১) স্বাক্ষরকারী রাজা বা রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব কোম্পানি গ্রহণ করবে। (২) এইজন্য চুক্তিবদ্ধ রাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন রাখা হবে। (৩) এই সেনাবাহিনীর পরিচালনা করবেন ইংরেজ সেনাপতি। (৪) সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার বহনের জন্য বৃহৎ রাজ্যগুলি নিজ নিজ রাজ্যের একাংশ কোম্পানিকে ছেড়ে দেবে। (৫) অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা ছোট রাজ্যগুলি ভূমির পরিবর্তে নির্দিষ্ট নগদ অর্থ দিতে পারবে। (৬) চুক্তিবদ্ধ রাজ্যগুলি ইংরেজের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো দেশীয় বা বিদেশী শক্তির সাথে মিত্রতা স্থাপন বা যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

অধীনতামূলক মিত্রতা'র জালে প্রথম ধরা পড়েন অস্থিরমতি ও অপদার্থ হায়দ্রাবাদের নিজাম। ১৭৯৮-র ১ সেপ্টেম্বর তিনি এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী ফরাসি প্রশিক্ষক দ্বারা তৈরি নিজামের বাহিনী ভেঙে দেওয়া হয়। সমস্ত ইউরোপীয়কে (ইংরেজ ছাড়া) বহিষ্কার করা হয়। তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণাংশ কোম্পানিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে নিজাম কোম্পানির সাথে আরও একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে অধীনতামূলক মিত্রতাকে পাকাপাকি রূপ দেন। এই চুক্তি দ্বারা হায়দ্রবাদে মোতায়েন ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের পুরস্কার হিসেবে নিজাম মহীশূরের যে ভূখণ্ড লাভ করেছিলেন, তাও কোম্পানির হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। এই চুক্তি স্বাক্ষর করার ফলে নিজাম শত্রুর আক্রমণ সম্ভাবনা থেকে রেহান পান। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ-নির্ভর হয়ে পড়ার ফলে রাজ্যের প্রশাসন ভেঙে পড়ে, এবং অরাজকতা গ্রাস করে সারা দেশকে।

অতঃপর ওয়েলেসলির নগ্ন হাত প্রসারিত হয় ইংরেজেরই দুর্দিনের বন্ধু এবং অতি বিশ্বস্ত ও আশ্রিত রাজ্য অযোধ্যার দিকে। রক্ষক ইংরেজ এখানে অবতীর্ণ হয় ভক্ষকের ভূমিকায়। কাবুলের অধিপতি জামান শাহ শতদ্রু নদী অতিক্রম করে দোয়াব অুচল দিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে পারেন এই অজুহাতে তিনি অযোধ্যা রাজ্যকে শক্তিশালী করে তুলতে মনস্থ করেন। তিনি অযোধ্যায় নবাব সাদাত আলিকে চাপ দিয়ে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করেন (১৮০১ খ্রিঃ)। নবাবের নিজস্ব বাহিনী ভেঙে দেওয়া হয় এবং অযোধ্যায় অবস্থিত ইংরেজ বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য নবাব নগদ অর্থের পরিবর্তে দোয়াব অঞ্চল, গোরখপুর, রোহিলাখণ্ড প্রভৃতি অঞ্চল কোম্পানির হাতে অর্পণ করতে বাধ্য হন।

ওয়েলেসলির অযোধ্যা-ব্যবস্থা তাঁর নগ্ন সাম্রাজ্যবাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ড উইলসন *(H.H. Wilson)*, লায়াল *(Sir A. Layall)* প্রমুখ এই নীতির তীব্র সমালোচনা করে এটিকে ইংরেজের পক্ষে অমর্যাদার বলে মন্তব্য করেছেন। এমনকি ইংল্যান্ডের উচ্চ কর্তৃপক্ষও ওয়েলেসলির এই কাজকে সমর্থন করেননি। বস্তুত অযোধ্যার প্রতি বড়লাটের আচরণ কোম্পানির বিশ্বস্ততাকেই বিপর্যস্ত করেছিল। একটা স্বাধীন ও শান্তিপ্রিয় জাতি এবং অতি বিশ্বস্ত একজন বন্ধুর রাজ্য যেভাবে গ্রাস করা হয়েছিল তা অভূতপূর্ব। এর ফলে অযোধ্যা তিন দিক থেকে কোম্পানির রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়ে, যা স্বাধীন অস্তিত্বরক্ষার পক্ষে ছিল বিপজ্জনক। নিজস্ব বাহিনী ভেঙে যাওয়ার ফলে নবাব সম্পূর্ণভাবে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েন। নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা গ্রাস করে সমগ্র দেশকে যা কোম্পানির পক্ষে এই রাজ্যকে গ্রাস করা সহজ করে দেয়। অধীনতামূলক মিত্রতা'র অভিশাপ অযোধ্যাতে যে অরাজকতা ডেকে আনে, তার দোহাই দিয়ে কোম্পানির নির্দ্বিধায় অযোধ্যাকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়।

ওয়েলেসলির পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হল মারাঠা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওকে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ করা। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে অহল্যাবাঈ, নানা ফড়নবিশ প্রমুখ অধিকাংশ মারাঠা নেতার মৃত্যু ঘটেছিল। ফলে মারাঠানের অন্তর্দ্বন্দ্ব ভীষণভাবে বেড়ে যায়। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও ছিলেন সম্পূর্ণ অপদার্থ ও অদূরদর্শী। হোলকার ও সিন্ধিয়া প্রমুখ মারাঠা সর্দারদের অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে তিনি নিজের ও জাতির সর্বনাশ ডেকে আনেন। নিজের পদ সামলানোর জন্য তিনি অতীত ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে ইংরেজের দ্বারস্থ হন। ইতিপূর্বে যে মারাঠাগণ অধীনতামূলক মিত্রতা

চুক্তিতে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল, পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও শেষ পর্যন্ত সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। 'বেসিনের চুক্তি' (১৮০২ খ্রিঃ) দ্বারা তিনি কোম্পানির অধীনতা মেনে নেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বেসিনের চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। পেশোয়া ছিলেন মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের কেন্দ্রীয় চরিত্র। স্বভাবতই পেশোয়া কোন চুক্তি স্বাক্ষর করলে তার দায় বর্তায় সমগ্র মারাঠাজাতির উপর। অবশ্য বেসিনের চুক্তিকে অন্যান্য মারাঠা নেতৃবৃন্দ চূড়ান্ত বলে মেনে নেননি এবং সেজন্য তাঁদের কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধেও অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। কিন্তু সবকিছুর পরিণতি ছিল ইংরেজের অনুকূল। পেশোয়া এই চুক্তি স্বাক্ষর করে মারাঠাজাতির মনোবলে যে ভাঙন ধরান এবং কোম্পানির মনোবলে শক্তি সঞ্চার করেন, তার ফলে মারাঠাজাতি ইংরেজের পদানত হতে বাধ্য হয়। বিস্তৃত আলোচনা ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্ক দ্রষ্টব্য।

ওয়েলেসলি ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতবাসীর সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি প্রযুক্ত হয়েছিল। তাঁর বিচারে ভারতীয় শক্তিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুর্বলতা, ঘরে-বাইরে নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি কারণে ওইসব রাজ্যের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছিল। অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করে ওইসব ত্রুটিমুক্ত হওয়া যাবে এবং ফলে ভারতীয় রাজ্যগুলিতে স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে। কিন্তু বাস্তবে ওয়েলেসলির এই পর্যালোচনা ছিল ছিল 'ভান ও ভণ্ডামি মাত্র'। তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে, এই চুক্তির শর্তাবলী কোন স্বাধীন, সার্বভৌম রাজ্যের স্বাভাবিক বিকাশের অনুকূল হবে না। পক্ষান্তরে, এদেশে ইংরেজের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনে ও ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব *(Pax Britannica)* প্রতিষ্ঠার পক্ষে সহায়ক হবে এই চুক্তি। স্বেচ্ছায় বা চাপে পড়ে যে সকল রাজ্য এই চুক্তি গ্রহণ করে, অল্প সময়ের সেগুলিতে প্রশাসনিক জটিলতা প্রকট হয়ে ওঠে এবং বিশৃঙ্খলা গ্রাস করে। চুক্তিতে আবদ্ধ রাজারা কোম্পানির হাতের পুতুলে *(puppet)* পরিণত হন। দেশীয় সেনাবাহিনী ভেঙে দেবার ফলে অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের উপরেও তার প্রভাব পড়ে। বহু কর্মচ্যুত সৈনিক চুরি-ডাকাতি করে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করে। অনেকে পিণ্ডারী দস্যুদের দলে যোগদান করে। কোম্পানির উপর নির্ভরশীল এইসব রাজপুরুষ প্রজাদের মঙ্গলসাধনের দায়-দায়িত্ব থেকে দ্রুত সরে আসতে থাকেন। ফলে রাজকীয় শোষণের মাত্রা সীমাহীনভাবে বাড়তে থাকে। জেমস মিল মন্তব্য করেছেন যে, 'নিজ নিজ সামরিক দুর্বলতা দেশীয় রাজাদের অত্যাচার ও শোষণকে একটা মাত্রায় সীমাবদ্ধ রেখেছিল। কিন্তু অধীনতামূলক মিত্রতাজনিত সামরিক নিরাপত্তাবোধ তাদের সীমাহীন অত্যাচারীতে পরিণত করে। তাঁর ভাষায় : *"The oppression of the native governments were limited by their weakness. When they received the use of English strength their oppression were limited by nothing."* সর্বাঙ্গীণ শোষণ ও অত্যাচারে গ্রামগুলি শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল। টমাস মনরো লিখেছেন : *"Where ever the subsidiary system is introduced the country will soon bear the marks in it of decaying villages and decreasing population"* এক কথায় অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির সাফল্য এক নির্দিষ্ট কেন্দ্রে ছিল সীমবদ্ধ; এবং তা হল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতি।